জঙ্গলবাসী ও রাষ্ট্রের সংঘাত

সরজিত মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক মার্কবাদী কমিউনিস্ট দলের বিভিন্ন বিষয়ে জোরালো বক্তব্য একসময় আমাদের যুব মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা শাসন ক্ষমতায় এসেছিল, পরবর্তীকালে তারা সেই একই রকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অবতার হয়ে দেখা দিল। সাধারণ মানুষের স্বার্থ আর শ্রেণি - বিভক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থে যে সংঘাত থাকেই, শাসক বামপন্থীরা সেটা বুঝেই রাষ্ট্রের সঙ্গে আপোস করে দিন গুজরানের চেষ্টা করছে। ইতিহাসের সময়ে পিছিয়ে ভাবলে প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি এই বামপন্থীরা আমাদের নিয়ে মোটেই ভাবিত ছিল ? না কি বুজরুকি দিয়ে মানুষকে কাছে টেনেছিল ? না কি তাদের বক্তব্য আমাদেরই বুঝতে ভুল হয়েছিল ধরেই দু একটা ভাবনা উপস্থিত করছি।

আসলে যুবক বয়সে না বোঝার এক মহা আনন্দ ছিল। তখন ''ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম'' কথার অর্থ জানতাম না, কারণ দার্শনিক তত্ত্ব দূরের কথা ইংরাজি ভাষাটাও ভাল করে শেখা হয়নি। সংগ্রাম বলতে বুঝতাম ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও। অর্থাৎ কারুর ক্ষতি কর। পরে যখন দাস ক্যাপিটাল এবং অন্যান্য বইতে দাঁত ফোটাবার চেষ্টা করলাম, তখন একটু একটু করে বুঝতে পুরলাম যে মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা ঐসব ভড়কানো কথা বলতেন, নিজেরা কিছু না বুঝেই। সবই ছিল ফাঁকা আওয়াজ। বস্তুর জগৎটাকে হস্তগত এবং কুক্ষিগত করাই ছিল মূল লক্ষ্য। এটা করতে হলে রাষ্ট্রের তাঁবেদারি করে ক্ষমতায় থাকা জরুরি। আবার গণতন্ত্রের সেটা করতে গেলে সাধারণ মানুষের স্বার্থহানি হতে পারে। দুটোকেই ধরে রাখতে হলে যা দরকার তাই তাঁরা করে থাকেন। একদিকে সংগ্রামী বুলি (rhetoric)। অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে নীরব আপোসের কর্মসূচী। মানুষ তাই বিভ্রান্ত।

এই আপোসের ফল, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কৃষককে উৎখাত করে পুঁজিপতিদের জমি দেওয়া, 'স্পেশাল ইকনমিক জোন', তৈরি করা, গুন্ডাবাজি করে 'বৈদিক ভিলেজ' তৈরি বা শহরের বস্তি উচ্ছেদ, প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরিতে মদত দেওয়া। এর থেকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চুলোয় গেছে। বোঝা যায় কোনদিনই নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়া বস্তবাদী চিন্তার বাইরে মানবতাবাদ শাসনকালের সংগ্রামের ভিত্তি ছিল না। এর ফলে মার্কসবাদী শাসকদল ক্রমশ গণভিত্তি হারিয়ে বসেছে।

এই শাসকদলের রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে আপোসের চিত্রটা ধরে ফেলেছিল নক্সালপন্থীরা। নক্সালপন্থী অংশটুকু সি পি এম দলটা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রশক্তির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এই ভেকধারি কমিউনিস্টদের সঙ্গে নিয়ে চলতে তাদের অসুবিধা নেই। তাই ১৯৬৯ -উত্তর সময়ে প্রথম সুযোগেই সি পি এম হাজির হল লালবাড়িতে, এবং মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসল।

নক্সালপন্থা ছিল নানা গলদ - দুষ্ট। এদের গণভিত্তি ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতি ছিল না। শ্রেণি শত্রু খতম করার নামে খুনের রাজনীতিতে মানুষকে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে গণবিচ্ছিন্ন, নানা ভাগে বিভক্ত ছিল উপদল। এলো মাওবাদীরা নানা উপদলে বিভক্ত ছিল; অন্ধ্রপ্রদেশে জনযুদ্ধগোষ্ঠী, কোথাও মাওইস্ট কমিউনিস্ট সেন্টার, সি পি আই (মাওবাদী), ইত্যাদি নামে। লক্ষণীয় যে এই দলগুলো নক্সালপন্থীদের মত গণভিত্তিহীন নয়। এরা একদিকে ভারতে সর্বাধিক বঞ্চিত, অবহেলিত আদিবাসীদের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে তাদের মানবিক অধিকার এবং তা লঙ্ঘিত হওয়ার রাজনীতিবোধ দিয়েছে, আর একদিকে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য নিজেরাও একত্রিত হয়েছে সি পি আই (মাওবাদী) নামে। নেপালে মাওবাদীদের উত্থান ও ভারতে পুঁজি বা ধনিক - শ্রেণির স্বার্থ পুষ্ট অর্থনৈতিক পরিবর্তন মাওবাদীদের একত্রিত হওয়ার দুটো প্রেক্ষিত ধরা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে উত্তর - উপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রশক্তি কতটা স্বাধীন ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু ১৯৮০-র দশক থেকে রাষ্ট্রের নগ্ন দৃশ্যটা ক্রমশই প্রকট হচ্ছিল। ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারত সরকার আর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়াতে, কল্যাণ রাষ্ট্রের ভূমিকা থেকে অনেকটা সরে এসেছে। ফলে বঞ্চিত আদিবাসীরা অনুন্নয়নের শিকার হয়ে রইল। অনুন্নয়নের নমুনাগুলো দেখা যাবে ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল।

যুগ যুগ ধরে আমাদের তথাকথিত সভ্য সমাজের তাড়া খেয়ে আদিবাসীরা জঙ্গলমহলে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে জীবন বড় কঠিন। প্রায়শই জঙ্গলঘেরা পাহাড়ি, রুক্ষ জমিতে এদের বাস। কৃষি এক - ফসলি। পানীয় এবং সেচের জলের অভাব। রাস্তা কাঁচা। শিক্ষাব্যবস্থা ধুঁকছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা দুষ্প্রাপ্য। জঙ্গলের ফল, মূল, মধু, কাঠ, শালপাতা, কেন্দুপাতা ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষ জীবন ধারণ করছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাও নেই। প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে গোষ্ঠীজীবনই এদের বেঁচে থাকার উপায়। এই মানুষগুলোকে মাওবাদীরা বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছে, তাদের অধিকারবোধ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়েছে। এসব জায়গায় অতিবামপন্থীদের শিকড়

বিস্তারের যৌক্তিকতা যোজনা কমিশনের একটা রিপোর্টেই বলা হয়েছে।

মজার ব্যাপার হল এই জঙ্গলভূমির নিচে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান খনিজ পদার্থ। ছত্তিশগড়ে আছে ৪, ১৪,৪২০ লক্ষ টন কয়লা (ভারতের মোট কয়লার ১৬.৩৬ শতাংশ), আকরিক লোহা আছে ২৭,৩১০ লক্ষ টন (১৮.৬৭ শতাংশ), আকরিক টিন ৩২৬.২ লক্ষটন (৩৮ শতাংশ), হীরা ১৩ লক্ষ ক্যারট (২৮ শতাংশ)। তেমনি ঝাড়খণ্ডে আছে কয়লা যা ভারতের মোট সম্ভাব্য পরিমাণের ২৯ শতাংশ, আকরিক লোহা আছে ১৪ শতাংশ, প্রচুর পরিমাণে অভ্র। ওড়িষ্যাতেও আছে নানা ধরণের খনিজ সম্পদ, যার মধ্যে বক্সাইট অন্যতম প্রধান আকরিক। এই তিন রাজ্য ভারতের প্রথম তিন খনিজ রত্ন।

এই খনিজ পদার্থ শিল্পের জন্য ব্যবহার করার এক বিশৃঙ্খল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। ছত্তিশগড়ের বাইলাডিলা লোহার খনি যাতে বেসরকারি হাতে না যেতে পারে তার জন্য অজিত যোগীর মুখ্যমন্ত্রীত্বে ছত্তিশগড় সরকার খনিটি কিনতে চেয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি হাতেই খনিটিকে তুলে দেওয়া ঠিক সাব্যস্ত করল। তাও কম দামে। দক্ষিণ কোরিয়ার পস্কোকে জমি দেওয়া নিয়ে ওড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে আদিবাসীরা আন্দোলন করল। অনেক প্রাণ হারাল। তবুও আদিবাসীরা নাছোড়। পশ্চিমবঙ্গের শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানা তৈরি নিয়ে একই কাহিনী। তার থেকেই লালগড় সম্যস্যার সূত্রপাত। এই খনিজ পদার্থ নিয়ে ব্যবসার পথে মাওবাদী এবং আদিবাসীরাই পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আদিবাসীদের না তাড়াতে পারলে এসব জায়গার দখল নেওয়া যাবে না। গাছ কেটে বনাঞ্চল নিকেশ করা যাবে না।

উল্টোদিকে আদিবাসীরাই বা যাবে কোথা? জঙ্গল সম্পদকে জীব বৈচিত্র্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যবহার করে এরা যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে সেখানেই। জঙ্গলের বাইরে আর এক জঙ্গল-ভদ্রলোকদের বাস। সেখানে এরা বেমানান। কারণ ভদ্রলোকরা এদের সহ্য করতে পারে না। মনে রাখবেন দিল্লিতে ভিক্ষা করা যায় না। সেখান থেকে ভিখারি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চেন্নাই শহরে 'নারিকুরবা' নামে একদল আদিবাসী শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ফুটপাতে বাস করত, প্রায় নগ্ন এই মানুষগুলো মরা ইঁদুর, কুকুর, মরা পাখি বা গৃহস্থের ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে নিত। তাদের পক্ষে শহরে অন্য খাদ্য যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। এটা দু:খজনক, অনভিপ্রেত নিশ্চয়ই। কিন্তু শহরের ওই অঞ্চলগুলো পরিষ্কার থাকত। ২০০০ সালে সিঙ্গাপুরের এক বেসরকারি সংস্থাকে শহর সাফ রাখার বরাদ্দ দেওয়া হয়। তারা দিনে তিন চারবার ময়লা তুলে নিত বলে 'নারিকুরবা' গোষ্ঠীর চেন্নাই শহরে খাদ্যাভাবে বাস করা কঠিন হয়ে গেল। তারা অন্যত্র চলে গেল। সুতরাং জঙ্গলের বাইরেও আদিবাসীদের স্থান নেই। তাহলে জঙ্গলমহল থেকে উচ্ছেদ হয়ে এরা যাবে কোথায়? তাই এদের স্বস্থানে বেঁচে থাকার জন্য অনেক আদিবাসী সংগঠন তৈরি হয়েছে। জঙ্গলে সসম্মানে বাঁচার অধিকার আন্দোলন স্বতস্ফূর্ত।

আসল বিষয় এই বনাঞ্চলগুলো পাহারা দিতে হবে, যাতে রাষ্ট্র সস্তায় তা বিকিয়ে দিতে না পারে। মাওবাদী হোক বা জঙ্গলের মূলবাসী, আদিবাসীই হোক, কাউকে তো পাহারা দিতে হবে! এখানেই রাষ্ট্রের আপত্তি; ভোটে জেতা প্রতিনিধি তার হয়ে সকলের অভিভাবক। তাই শ্রী চিদম্বরম বা বুদ্ধবাবুর অভিভাবকত্বের এত দাপট। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে রাষ্ট্রের সহযোগী হয়ে বসে আছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের সহযোগিতা থেকে সরে এসেছে ডি এফ আই ডি এ ডি বি, বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে। বেচে দিয়েছে একের পর এক রাজ্য সরকারি সংস্থা। বেসরকারি কারখানা বন্ধ বা রুগ্ন। সমতলে কৃষকের জমিতেও হাত পড়েছে।

ওদিকে রাষ্ট্র পুঁজির চাহিদা অনুযায়ী 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' তৈরীর রাজ্য সরকার এক পায়ে খাড়া। শালবনীতে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানাকে এস ই জেড বানানো নিয়েই শুরু হয়েছে লালগড় সমস্যা। জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের বনসম্পদের ওপর বেসরকারি নিয়ন্ত্রণ জারি হবে। ক্ষুণ্ণ হবে গরিবদের খাদ্য - নিরাপত্তা। বাঁচার তাগিদে আদিবাসীদের গণসংগঠন তৈরি হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদে মুখর আদিবাসীরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশের জঙ্গলে, পশ্চিমে ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র বনাঞ্চলে মাওবাদীরা নিজেদের সংগঠন বিস্তার করেছে। তারা আদিবাসীদের মুক্তির পথ দেখাতে চায়। একাজে কতদূর সফল হবে তা বলা সম্ভব নয়।

মাওবাদীদের বিস্তারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বড় অবদান আছে। যেহেতু তারা বাম শাসকদের শ্রেণিশত্রু নয়, সেহেতু মাওবাদীদের সশস্ত্র আন্দোলনের উত্তরে রাজনৈতিক মোকাবিলার কথা বলে মূল সমস্যা (আদিবাসীদের) থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাওবাদীদের শয়তান বলেছেন, কখনো শত্রু বলেছেন বলে শুনি নি। দিল্লিতে চিদম্বরমের চোখ রাঙানি খেয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী একটু কড়া হওয়ার ঢং করেছেন মাত্র। আসলে বেশি করা হলে আলমারি থেকে অনেক কঙ্কাল বেরোবে। তাই যৌথবাহিনী অভিযানের লক্ষ্য, আদিবাসীদের টাইট দেওয়া। এতদিনেও মাওবাদী ধরা পড়ল না কিন্তু আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার বিন্দুমাত্র কমল না! তাহলে কি গরিব আদিবাসীরা শ্রেণীশত্রু? এখানে rhetoric আর action এর মধ্যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আমরা শাসক বামপন্থীদের বড়দাকে ঠিক বুঝছি তো?